শান্তিবাহিনীর তদারকিতে ১৯৮৯ সালের ২১শে নভেম্বর নামিবিয়ার নির্বাচিত সংবিধান সভা সংবিধান রচনার কাজ শুরু করে। পরিণামে ১৯৯০ সালের ২১শে মার্চ নামিবিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে। শান্তিবাহিনী গঠনের সর্বশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯৯৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি। ২২,০০০ সৈন্য ও অসামরিক কর্মচারী নিয়ে গঠিত এই বাহিনীর মূল দায়িত্ব ছিল গৃহযুদ্ধে ক্লান্ত কাম্বোডিয়ায় ১৯৯৩ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের তদারকি করা ও এলাকায় শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। খেমার রুজ গোষ্ঠীর বয়কট সত্ত্বেও নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং **প্রিন্স নরোদম সিহানুক**-এর নেতৃত্বে নতুন গণতান্ত্রিক সরকার কার্যভার গ্রহণ করে। এই মুহূর্তে দেখা যায় যে, ১৬টি দেশে রাষ্ট্রসংঘের সাফল্যের সঙ্গে শান্তিরক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং এজন্য মোট বার্ষিক ব্যয় হচ্ছে ২১ কোটি মার্কিন ডলার। কাজেই বলা চলে যে, রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রমের ইতিহাস যথেষ্ট গৌরবোজ্জল। তবে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, ঠান্ডা যুদ্ধের চলাকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ এবং তাদের প্রভাবাধীন অঞ্চলে সংঘর্ষের মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠাতে পারে নি। একইভাবে চীন-সোভিয়েত সীমান্ত সংঘর্ষ, চীনের তিব্বত দখল, চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিরোধের মোকাবিলায় শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রম কার্যকর করা সম্ভবপর হয় নি।

সমালোচনা

শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রমের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাও অস্বীকার করা যায় না। যেমন—**প্রথমত,** রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী কোনও শান্তিরক্ষা বাহিনী গঠন করা সম্ভব হয় নি বলে পুরো কার্যক্রমটিই এক অস্থায়ী ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে আছে। **দ্বিতীয়ত,** সদস্য রাষ্ট্রদের প্রদত্ত চাঁদার উপর নির্ভর করে শান্তিরক্ষার কাজ চালাতে হয় বলে কখনও কখনও শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রম গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়। শান্তিরক্ষার জন্য রাষ্ট্রসংঘের নিজস্ব এক বাজেট থাকলে এই সমস্যা এড়ানো যেত। **তৃতীয়ত,** শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রমের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ নিরাপত্তা পরিষদের উপর ন্যস্ত বলে মহাসচিব এ ব্যাপারে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রমের সাফল্যের পক্ষে এ-ও এক বড়ো বাধা। **চতুর্থত,** শান্তিরক্ষা বাহিনীর অধিকার অব্যাহতি ইত্যাদি বিষয়েও কোনও সুস্পষ্ট লিখিত নিয়ম নেই। এতেও অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। তথাপি এই কার্যক্রমের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বশান্তি রক্ষায় রাষ্ট্রসংঘ যে এক সজাগ প্রহরীর ভূমিকা পালন করে চলেছে শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রম তার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।

*ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights) ঃ

রাষ্ট্রসংঘের সনদের অন্তত সাতটি জায়গায় বিশ্বে মানবিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের দায়বদ্ধতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়—এগুলি হল *প্রস্তাবনা, ১ নং ধারা, ১৩*

* কেবলমাত্র কলিকাতা ও বারাসত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য।

ধারা, ৫৫ নং ধারা, ৬২ নং ধারা, ৬৮ নং ধারা এবং *৭৬ নং ধারা*। সনদের এই প্রস্তাবনা ও বিভিন্ন ধারা প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোক্তারা সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন যে মানবিক অধিকার লঙ্ঘন পৃথিবীতে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার অন্যতম কারণ। এই কারণে সদস্য রাষ্ট্রদের নিজ নিজ দেশে মানবিক অধিকার রক্ষায় সতত সচেষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর মানবিক অধিকারের বিশ্ব ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights) গৃহীত হয়। এই ঘোষণাপত্রের ৩০টি ধারায় মানবিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারই স্থান পেয়েছে। ঘোষণাপত্রটিতে নানা ধরনের তাত্ত্বিক ভাবনার সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। যেমন, এতে যে সব পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার তালিকাভুক্ত হয়েছে সেগুলি প্রাচীন, সাবেকি উদারনীতিবাদী (Liberal) ভাবনা দ্বারা পরিপুষ্ট। অন্যদিকে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলি স্পষ্টতই সমাজবাদী (Socialist) আদর্শের অনুসারী। আবার আধুনিক উদারনীতিবাদী তত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঘোষণাপত্রের ২৯ নং ধারায় মানবিক অধিকারগুলি যাতে নাগরিকরা সমানভাবে ভোগ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নৈতিকতা, জনশৃঙ্খলা এবং সাধারণ কল্যাণের স্বার্থে সার্বভৌম রাষ্ট্রকে তার আইনের দ্বারা মানবিক অধিকারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন তত্ত্বের সহাবস্থান

রাষ্ট্রসংঘের এই ঘোষণাপত্র মানবিক অধিকার সম্পর্কিত এক পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম দলিল হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এতে অন্তর্ভুক্ত *পৌর অধিকারগুলি* (Civil Rights)-র মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ (১) মর্যাদা ও অধিকারে সমতা ও স্বাধীনতার অধিকার (১ নং ধারা), (২) বৈষম্যের বিরুদ্ধে অধিকার (২ নং ধারা), (৩) ব্যক্তির জীবনের, স্বাধীনতার ও নিরাপত্তার অধিকার (৩ নং ধারা), (৪) আইনের সামনে সমানভাবে বিবেচিত হওয়ার এবং আইনের কাছ থেকে সমভাবে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার (৭ নং ধারা), (৫) সম্পত্তির অধিকার (১৭ নং ধারা), (৬) বাক্-স্বাধীনতা (১৮ নং ধারা), (৭) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা (১৯ নং ধারা), (৮) শান্তিপূর্ণভাবে সংগঠিত হওয়ার ও সংগঠন তৈরির অধিকার (২০ নং ধারা), (৯) উৎপীড়ন ও অমানবিক শাস্তির বিরুদ্ধে অধিকার (৫ নং ধারা), (১০) যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার বা আটক হওয়ার বিরুদ্ধে অধিকার (৯ নং ধারা), (১১) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয়ের কাছে ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকার (১০ নং ধারা), (১২) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের গোপনীয়তায় যথেচ্ছ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অধিকার (১২ নং ধারা) ইত্যাদি।

পৌর অধিকারসমূহ

ঘোষণাপত্রে স্বীকৃত *সামাজিক অধিকারগুলির* মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ (১) প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর বিবাহ করার, পরিবার গঠনের এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে এই পরিবারের সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার (১৬ নং ধারা), (২) সমাজের সদস্য হিসাবে প্রত্যেকের সামাজিক নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার (২২ নং ধারা), (৩) শিক্ষার, বিশেষত বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার এবং পিতা-মাতার তাঁদের সন্তানদের জন্য নিজেদের

পছন্দমতো শিক্ষার ব্যবস্থা করার অধিকার (২৬ নং ধারা), (৪) ঘোষণাপত্রে লিপিবদ্ধ মানবিক অধিকার উপভোগ করার উপযুক্ত সমাজব্যবস্থা পাওয়ার অধিকার (২৮ নং ধারা),

সামাজিক অধিকারসমূহ

(৫) নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার জন্য উপযুক্ত জীবনযাত্রার মান পাওয়ার অধিকার (২৫ নং ধারা), (৬) আর এই পরিপ্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং বেকারত্ব, অসুস্থতা, অক্ষমতা, বার্ধক্য, বৈধব্য ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থায় উপযুক্ত নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার (২৫ নং ধারা), (৭) প্রসূতি ও শিশুদের বিশেষ যত্ন এবং সাহায্য পাওয়ার অধিকার (২৫ নং ধারা) ইত্যাদি।

ঘোষণাপত্রে যে সব *রাজনৈতিক অধিকার* স্বীকৃতি পেয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ঃ (১) প্রত্যেকের নাগরিকত্ব লাভ ও বদলের অধিকার এবং যথেচ্ছভাবে

রাজনৈতিক অধিকারসমূহ

নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত না হওয়ার অধিকার (১৫ নং ধারা), (২) প্রত্যেকের প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজের দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার (২১ নং ধারা), (৩) প্রত্যেকের সমানভাবে তার নিজের দেশের সরকারি পরিষেবা পাওয়ার অধিকার (২১ নং ধারা), (৪) গণ-ইচ্ছার ভিত্তিতে সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সর্বজনীন ভোটাধিকার, গোপন ভোট ও অবাধ ভোটদান প্রথার ভিত্তিতে নিয়তকালিক (Periodic) নির্বাচনের ব্যবস্থা (২১ নং ধারা) ইত্যাদি।

ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত *অর্থনৈতিক অধিকারগুলি* হল ঃ (১) জীবিকা অর্জনের, জীবিকা অবাধে বেছে নেওয়ার, কর্মক্ষেত্রে ন্যায্য ও অনুকূল পরিবেশ পাওয়ার এবং বেকারত্বের

অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ

বিরুদ্ধে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার (২৩ নং ধারা), (২) কোনওরূপ বৈষম্য ছাড়া সমান কাজে সমান বেতন পাওয়ার অধিকার (২৩ নং ধারা), (৩) নিজের ও পরিবারের মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার পক্ষে উপযুক্ত, ন্যায্য পরিমাণ বেতন পাওয়ার এবং প্রয়োজনে এ ব্যাপারে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার (২৩ নং ধারা), (৪) প্রত্যেকের নিজের স্বার্থরক্ষার্থে শ্রমিক সংঘ (Trade Union) গঠনের এবং তাতে যোগদানের অধিকার (২৩ নং ধারা), (৫) প্রত্যেকের বিশ্রাম ও অবকাশ লাভের অধিকার (২৪ নং ধারা) যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত দৈনন্দিন কাজের সময়সীমা যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারিত হওয়ার অধিকার এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সবেতন ছুটি পাওয়ার অধিকার (২৪ নং ধারা)।

স্বীকৃত *সাংস্কৃতিক অধিকারের* মধ্যে অন্যতম হল ঃ (১) প্রত্যেকের দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণের, কলাশিল্প উপভোগের এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে অংশগ্রহণের ও তার সুফলের ভাগ নেওয়ার অধিকার (২৭ নং ধারা), (২) প্রত্যেকের বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলা সংক্রান্ত কোনও কর্ম থেকে প্রসূত নৈতিক ও বস্তুগত স্বার্থ সম্পর্কে উপযুক্ত সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার (২৭ নং ধারা)।

১৯৪৮ সালের বিশ্ব ঘোষণাপত্র ছাড়াও পরবর্তীকালে মানবিক অধিকার সংক্রান্ত

বিশেষ কয়েকটি ঘোষণাপত্র সাধারণ সভা অনুমোদন করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ ১৯৫৯ ও ১৯৯১ সালের শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র, ১৯৬০ সালের

অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাপত্র

উপনিবেশ ও তাদের জনসাধারণকে স্বাধীনতা দানের ঘোষণাপত্র, ১৯৬৩ সালের সর্বপ্রকার বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র, ১৯৬৭ সালের নারীবৈষম্য রদ সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র, ১৯৭৫ সালের সকল প্রকার অমানবিক অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শাস্তি থেকে সকল মানুষের সুরক্ষা সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র, ১৯৮১ সালের ধর্ম ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সর্ববিধ অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র এবং ১৯৮৪ সালের সকল মানুষের শান্তির অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র।

এছাড়া ১৯৯৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশন সারা বিশ্বে যে সব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে সচেষ্ট তাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য নতুন একটি

১৯৯৮ সালের ঘোষণাপত্র

ঘোষণাপত্রের খসড়া অনুমোদন করেছে। এই খসড়া ঘোষণাপত্রটি অবশ্য এখনও সাধারণ সভা দ্বারা অনুমোদিত হয় নি। ইতিমধ্যে ১৯৭৬ সাল থেকে পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের উপর এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের উপর দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র কার্যকর হয়েছে। এছাড়া প্রায় প্রতি বছরই সাধারণ সভা বিভিন্ন দেশে মানবিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে কোনও দেশকে অভিযুক্ত করে প্রস্তাব পাস করে।

মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয় ও কাজকর্ম করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ। সনদের ৬২-৬৩ নং ধারা এই সংস্থাকে

মানবাধিকার কমিশন

স্পষ্টতই এই দায়িত্ব দিয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক গঠিত মানবাধিকার কমিশন এই দায়িত্ব পালনের মূল মাধ্যম হিসাবে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে ৪৩টি রাষ্ট্র এই কমিশনের সদস্য। অন্যদিকে পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের উপর যে চুক্তিপত্র ১৯৭৬ সাল থেকে কার্যকর হয় তার ২৮ নং ধারা অনুযায়ী ১৮ জন সদস্য নিয়ে একটি মানবিক অধিকার কমিটি গঠিত হয়েছে। ১৯৭৭ সাল থেকে এই কমিটি মানবিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে নানা দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

এতৎসত্ত্বেও কিন্তু পৃথিবীতে মানবিক অধিকার রক্ষায়, বিশেষত মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিরোধে, কার্যত ব্যর্থ হয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। মানবিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে

মানবিক অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকার মূল্যায়ন

রাষ্ট্রসংঘের সদিচ্ছা প্রশ্নাতীত। এছাড়া এ বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও যথেষ্ট ব্যাপক ও সুসংগঠিত। তথাপি দুর্ভাগ্য এই যে, পৃথিবীর কোনও না কোনও জায়গায় প্রায় প্রতিদিনই মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে চলেছে এবং রাষ্ট্রসংঘ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যত এক নীরব ও নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে।

রাষ্ট্রসংঘের এই ব্যর্থতার মূল কারণ হল তার কর্তৃত্বের সীমাবদ্ধতা। মনে রাখতে হবে যে, যদিও রাষ্ট্রসংঘ মানুষের প্রয়োজনীয় মানবিক অধিকারগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের তালিকাভুক্ত করেছে, তথাপি এই অধিকারগুলিকে বলবৎ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রসংঘের নয়, এ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেমন যে কোনও ব্যক্তি মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে আদালতে যেতে পারেন, রাষ্ট্রসংঘের ক্ষেত্রে সে সুযোগ নেই। কারণ রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতে কেবলমাত্র রাষ্ট্রই বাদী বা বিবাদী হতে পারে, এই আদালতে ব্যক্তির অভিযোগ নিয়ে দ্বারস্থ হওয়ার কোনও অবকাশ নেই। তাছাড়া মানবিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে রাষ্ট্রসংঘ আলাপ-আলোচনা চালাতে পারে, সতর্ক করতে পারে এবং চরম ব্যবস্থা হিসাবে নিষেধাজ্ঞা (Sanctions) জারি করতে পারে। এর চেয়ে আরও কঠোর কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা রাষ্ট্রসংঘের নেই। রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুযায়ী অবশ্য মানবিক অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রসংঘ প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করতে পারে। তবে ঘটনা হল এই যে, আজ পর্যন্ত মানবিক অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রসংঘের বল প্রয়োগের ঘটনা কখনও ঘটে নি।

আসলে মানবিক অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগ শোনার মতো এবং এই অভিযোগের ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মতো কোনও প্রাতিষ্ঠানিক যন্ত্রও রাষ্ট্রসংঘের নেই।

আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার অভাব

রাষ্ট্রসংঘের আর এক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা হল এই যে, সামগ্রিকভাবে মানবিক অধিকারের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখলেও রাষ্ট্রসংঘ কখনও মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের বিশেষ কোনও একটি ঘটনা নিয়ে তৎপর হয়ে উঠতে পারে না। কারণ এই ধরনের তৎপরতা দেখানোর মতো কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাই রাষ্ট্রসংঘে নেই। অথচ মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিটি ঘটনার উপযুক্ত মোকাবিলা করতে না পারলে মানবিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিটি ঘটনায় নজর দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রসংঘে একটি মানবিক অধিকার কমিশনারের পদ তৈরির প্রস্তাব উঠেছিল অনেক দিন আগে। এই প্রস্তাব অবশ্য এখনও কার্যকর করা সম্ভব হয় নি।

ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানবিক অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিরোধে প্রত্যক্ষভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম হলেও মানবিক অধিকার সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা ও আন্দোলনের সূত্রপাত করতে পেরেছে রাষ্ট্রসংঘ। বস্তুত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর-পর্বে স্বাধীনতা-প্রাপ্ত অনেক দেশেই যে মানবিক অধিকার সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে তার পিছনে রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকার সম্পর্কিত বিশ্ব ঘোষণাপত্রের অবদান নিতান্ত কম নয়। তাছাড়া এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, দক্ষিণ আফ্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাষ্ট্রসংঘ এই দেশের বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে বিশ্ব-জনমতকে প্রবল করে তুলতে পেরেছিল এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির অবসান ঘটে। অতএব রাষ্ট্রসংঘ যে পৃথিবীতে মানবিক অধিকারের এক অতন্দ্র লহরী এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

মানবিক অধিকার রক্ষায় বিশ্ব-জনমত গঠনে সাফল্য